দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... JUL. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

প্রতিবন্ধীত্ব কোনো অভিশাপ বা পাপের ফলশ্রুতি নয়

বিশেষ পদ্ধতিতে ও কৌশলে শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রয়োজন

এস এম লাহেক আলী ঃ প্রতিবন্ধীত্ব কোন অভিশাপ নয়, এটা কোন পাপের ফলও নয়। সাধারণ মানুষের মনে এ ধরনের একটি সামাজিক কুসংস্কারের ন্যায় মিথ্যা ধারণা পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলছে।

এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করে মোঃ পান্নু মোল্লা (বিএ বিএস এন্ড এমএসএস) সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতর পঞ্চগড়ের হাউস প্যারেন্ট বলেন, প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেয়ায় ঐ শিশুর পাপ নয় বা কোন রকম অভিশাপও নয়। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা আছে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ শিশু অবস্থানের পর হতে তিন মাসের মধ্যে শিশুর হাত, পা, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদির গঠন হয়। আর এ সময়ের মধ্যে মায়ের শরীরে কোন খাদ্যের অভাব যেমন– ভিটামিন, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি অথবা মায়ের পেটে বড় ধরনের আঘাত বা মাদকদ্রব্যের ব্যবহারে ভূমিষ্ঠ নবজাতক শিশু যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী হতে পারে। আর এ ব্যাখ্যা হতে প্রমাণিত হয়, প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেয়ায় প্রতিবন্ধী শিশু দায়ী নয়; বরং বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবই এর জন্য দায়ী।

প্রতিবন্ধী শিশু জন্মের জন্য যদি পিতা-মাতাকে দায়ী করা হয় তাহলে প্রতিবন্ধীরা কেন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অবহেলার স্বীকার হবে? কেনই বা তারা শিক্ষা ও পুনর্বাসন হতে বঞ্চিত হবে? আর এ দায়িত্ব পরিবার ও রাষ্ট্রকে নিতে হবে এবং সমাজকে তা সহজেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার আমাদের দূর করতে হবে।

যেহেতু প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে, সেহেতু পরিবার ও রাষ্ট্রকে গুরুত্বের সাথে এ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া তাদের শিক্ষার বিশেষ পদ্ধতি একযোগে সারা বিশ্বে ব্যবহার হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য পিএল ঃ ৯৪-১৪২ নামে একটি আইন পাস করে। যার কারণে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসার লাভ করে। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক-মনীষীরা প্রমাণ করেন 'প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম'। আর এটা সান্ত্বনা নয়, অথচ প্রায়োগিক। কয়েকজন মনীষীর কথা ও মন্তব্য নিম্নরূপ।

লুইস ব্যারেল (ফরাসী) বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাক্ষেত্রে 'এ্যামবোসড্ ডট'-এর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া সম্ভব। তিনি এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

এডওয়ার্ড সিজুইন (ফরাসী) মানসিক প্রতিবন্ধীদের ইন্দ্রিয় ও পেশীসমূহের অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলছেন। থমাস হপকিংস (আমেরিকা) বলেন, অঙ্গভঙ্গি এবং আঙুলের দ্বারা বানান-এর সাহায্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেয়া যায়।

প্রতিবন্ধীদের জন্য যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন ঃ

ভ্যালেনতিন হুয়ে ১৭৮৪ সালে দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম ফ্রান্সে আবাসি[illegible] ...লেন। চালর্স মিসেল বধিরদের জন্য ১৭৫৫ সালে প্যারিসে পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। এ সময়ে রোটারী অন্ধ বিদ্যালয় নামে একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার সূচনা করে।

সুতরাং বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাকে মেনে নিতে পারি এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারি। আর এ কারণেই বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। দেশে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারী পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আবাসিক/অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪ জেলা সদরে বা থানায় সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্প চালু রয়েছে। তাছাড়া মানসিক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভাগীয় শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। আমার জানা মতে, অনেক দৃষ্টিহীন স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাস করেছে। সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্পে ১০ জন দৃষ্টিহীন 'রিসোর্স শিক্ষক' আছেন। যারা সবাই মাস্টার্স পাস করেছেন। মনসুর আহমেদ চৌধুরী নামে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, তিনি ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর একজন পরিচালক। প্রতিবন্ধীত্বের পার্থক্য নির্ণয় করে তাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের একজন বিশেষ শিক্ষক হিসেবে তাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের পদ্ধতি ও কৌশলের কিছু আলোচনা করছি। তবে এ কলামে শুধু শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

মূলত দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ভাগে ভাগ হয়ে থাকে। (১) পাঠ্যক্রম মোতাবেক শিক্ষা, (২) প্রশিক্ষণগত শিক্ষা। এ দু'য়ের সমন্বয়ে তারা পুনর্বাসিত হয়। দৃষ্টিহীনদের আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, (২) আংশিক/ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। অন্যদিকে উভয়ের শিক্ষার কৌশল ও পদ্ধতিও ভিন্নতর। (১) বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা ঃ এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় থাকে। এখানে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করবে। একে 'বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা' বলা হয়। শিক্ষার্থীদের এক বিশেষ পদ্ধতি, বিশেষ উপকরণ, ব্রেইল বই, কাগজ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষাক্রমের কোন ভিন্নতা নেই। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আবাসিক/অনাবাসিকভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

(২) সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথক বিদ্যালয় থাকে না। একই শিক্ষাক্রমের আওতায় একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে এদের সমন্বিত করা হয়। শিক্ষার্থীরা একই শ্রেণী কক্ষে শ্রেণী শিক্ষকের অধীনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে ক্লাস করে থাকে। তবে প্রতিবন্ধীদের পদ্ধতি ও কৌশলগত দিকের সমস্যা সমাধানের জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক একই বিদ্যাল[illegible] একটি রিসোর্স কক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্ভূত শিক্ষা সমস্যার সমাধান দিবেন। যেহেতু সাধারণ শিক্ষকদের প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেই, ফলে রিসোর্স শিক্ষক সাধারণ শিক্ষকের না পারা সমস্যার সমাধান দিবেন। তবে রিসোর্স কক্ষে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম থাকে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা আবাসিক/অনাবাসিক শিক্ষা নিতে পারে।

উপরি উক্ত তথ্যের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অন্ধদের চোখ নেই, কিভাবে পড়ালেখা করবে? পূর্বেই বলা হয়েছে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমের ন্যায়ই প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাক্রম। তবে এদের শিক্ষা পদ্ধতি, বই-খাতা, কলম এবং উপকরণসমূহ ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি গল্প, কবিতা, রচনা ইত্যাদি ব্রেইল পদ্ধতিতে ডটযুক্ত কোড থাকে। সে কোড নম্বরগুলো স্পর্শ করে বোঝা যায়। ব্রেইল পদ্ধতির লেখা বই-পুস্তক এরা সাধারণত তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল স্পর্শ করে পড়ে থাকে। অপরদিকে লেখার জন্য আলাদা কলম/কাগজ যথাক্রমে স্টাইনার্স শ্লেট ও ব্রেইল পেপার নামে পরিচিত। ব্রেইল পদ্ধতির প্রতিটি বর্ণ, শব্দ বা বাক্য স্পর্শ করে পড়া সম্ভব। নিম্নে একটি বাক্যের ব্রেইল কোডের ব্যাখ্যা দেয়া হল। যেমন ঃ আমরা বাংলাদেশকে গড়ি। ব্রেইল কোড পদ্ধতি ঃ

-০০০ ০--০০--০--০--০
-০--০০-০০--০-০০--০
০-০-০--০--০০-০-
০০০-০০০-০-
-০-০-----
-----০০---

এভাবে বাংলা, ইংরেজী, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের পৃথক পৃথক ব্রেইল কোড রয়েছে। দৃষ্টিহীনরা শুধু ব্রেইল ডটের কোডগুলো একেকটি বর্ণ হিসেবে নাম্বার মনে রাখে। কোন বর্ণের আকৃতি কালিতে লিখে না বা পড়ে না। ব্রেইল ডট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। দৃষ্টিহীনদের পড়ালেখার মাধ্যম ব্রেইল পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ফরাসীর লুই ব্রেইল। তিনি বলেন, ৬টি ডট বা ফোটার মাধ্যমে স্পর্শযোগ্য করে যে কেউ পড়তে বা লিখতে পারে যেমন ঃ

১০০৪, ২০০৫, ৩০০৬

ডট ৬টির বাম সারির নাম্বার উপর হতে ১, ২, ৩ এবং ডান সারির নাম্বার ৪, ৫, ৬। এ কোড নাম্বারের কোন রকমে অবস্থানগত পরিবর্তন হয় না। ব্রেইল পদ্ধতির অক্ষরগুলোর কয়েকটি উদাহরণ ঃ

অ = ০ - = ১, আ = = ঃ = ৩, ৫ আবার
A = ০ = ১
B = ঃ = = ১, ২, গণিতে ১ = ঃ - ০ -
১। ২ = ঃ - ঃঃ- = ১,২

বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করলে পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারবেন ঃ যেমন মোটা কাগজে 'সূচ' দিয়ে ছিদ্র করলে অবশ্যই কাগজের অপর পাতার ছিদ্র স্পর্শযোগ্য হবে। সুতরাং সূচ দিয়ে কাগজে ব্রেইল কোড নাম্বার মোতাবেক ছিদ্র করলে সকলেই অক্ষরটি বলতে পারবে।

দৃষ্টি প্র[illegible]হীনদের শিক্ষাদানে শিক্ষক TALK AND TOUCH পদ্ধতি ব্যবহার করেন। অপরদিকে প্রতিবন্ধীদের যতদূর সম্ভব FIRSTHAND EXPERIENCES দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সকল বিষয়ে ধারণা দিতে শিক্ষার্থীরা নানা প্রকার উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। যেমন ঃ

(১) ব্রেইল পেপার ঃ শিক্ষার্থীদের লেখার কাগজ।

(২) স্টাইনার্স ও শ্লেট-ব্রেইল পেপার শ্লেটে বসিয়ে স্টাইনার্স-কে কলম হিসেবে ব্যবহার করে লেখা হয়।

(৩) এ্যাবাকাস– অংক করার একটি উপকরণ।

(৪) ট্রেইলার ফ্রেম– এটাও অংকের হিসাব মিলানোর উপকরণ।

(৫) ব্রেইলার মেশিন– অল্প সময়ে অধিক লেখার সম্ভবপর একটি মেশিন।

(৬) অডিও ক্যাসেট ও পেটরেকর্ডার– পড়ার কাজে সহায়তা করে।

(৭) চশমা ও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস– ক্ষীণ দৃষ্টিমানদের ছাপা অক্ষর পড়তে সাহায্য করে।

(৮) ফেল্টটিপ– লেখার কলম। (৯) ব্রেইল রুলার ও কোণ– জ্যামিতির কাজ করতে সাহায্য করে। (১০) বড় ছাপার বই। (১১) মার্জিন রঙিন পেপার– ক্ষীণ দৃষ্টিমানদের লিখতে সাহায্য করে। (১২) উঁচু ডেস্ক– দাঁড়িয়ে পড়তে সহায়তা করে। (১৩) অন্যান্য উপকরণ– পরিবেশের জীব ও জড় বস্তুর আকৃতিকারই একেকটি উপকরণ। এগুলো বাঁশ, বেত, সুতা, মাটি, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করা সম্ভব।

অনেক মানুষের ধারণা, অন্ধদের অলৌকিক শক্তি রয়েছে। আসলে এটা ভ্রান্ত ধারণা। আসলে মানুষের কোন বিষয়ের ধারণা লাভে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে হয়। তার মধ্যে চোখের কাজ ৮০%। দৃষ্টিহীনদের চোখ নেই বলে তাদের এ ৮০% কাজ অন্য চারটি ইন্দ্রিয়ে ঢুকে পড়ে। ফলে মুখস্থ বিষয় এরা তাড়াতাড়ি শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে ধারণা লাভ করে। চোখের কাজ বন্ধ থাকাতেই এটা সম্ভব।

উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই সম্মানিত পাঠকবৃন্দ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা লাভ করেছেন। আমাদের অনেক প্রতিবন্ধী রয়েছেন, যারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। তাহলে আমরা কেন তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে বাধা হয়ে দাঁড়াব। সবশেষে আমি বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে বলব। ইচ্ছা বা চেষ্টার সমন্বয়েই আমরা যে কোন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে পারি। আর তাই প্রতিবন্ধীদের সমাজের বোঝা সৃষ্টি না করে শিক্ষা ও পুনর্বাসনের হস্ত প্রসারিত করি। তাদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করাই আমাদের সাধারণ মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। প্রতিবন্ধীরা শিক্ষিত হলেই তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা পাবে। অপরদিকে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় সামাজিক সমস্যা দেশ হতে দূর হবে।